বিশ্ব এইচ.আই.ভি/এইডস দিবস

হ্যারি কে টমাস, জুনিয়র
বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদুত

সারা বিশ্বব্যাপী এইচআইভি ভাইরাসের ব্যাপক বিস্তার সব কটি মহাদেশের লাখ লাখ মানুষের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এরই মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ২০ লাখ মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। ধারণা করা হয় প্রতিদিন প্রায় ৮,৫০০ নর-নারী ও শিশু এই রোগে প্রাণ হারাচ্ছে। যে সময়ের মধ্যে আপনি এই লেখাটি পড়ে শেষ করবেন তারই মধ্যে অন্তত আরো ১৮ জন ব্যক্তি এইড্স-এ আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাবে। যদি সম্মিলিতভাবে এখন থেকেই কার্যকর উদ্যোগ না নেয়া যায় তাহলে আগামী ২০১০ সালের মধ্যে আরো সাড়ে চার কোটি মানুষ নতুন করে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হবে। আর এর ফলে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়াতেও এইড্স রোগ মহামারী আকার ধারণ করবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশংকা প্রকাশ করছেন।

এইচআইভি/এইড্স কোন চাপিয়ে দেয়া মানবিক বিষয় নয়। এই রোগ সামাজিক গঠন কাঠামোকে অশ্রুসিক্ত করে তুলছে। সেই সাথে মুক্ত পরিবেশে সুন্দর আগামীর জন্য যেসব দেশে সদ্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাও এই রোগটির ফলে হুমকির মুখে পড়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশেরই মানব সম্পদকে এই রোগটি পঙ্গু করে দিচ্ছে। অথচ বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির জন্য এসব মানব সম্পদের উন্নয়ন প্রয়োজন। যদি প্রতিরোধ করা না যায় তাহলে এইচআইভি/এইড্স পৃথিবীর সব দেশ ও অঞ্চলকেই অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। কোন রাষ্ট্রই ভৌগলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় কারণে এই প্রাণঘাতী রোগটির আক্রমণ থেকে নিরাপদ নয়। বিশ্ব বাণিজ্য ও পর্যটন ব্যবস্থা আমাদের সবাইকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। আসলে আমরা সবাই একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন।

এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে সাফল্য ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলোকে তুলে ধরার জন্যই প্রতি বছর বিশ্ব এইড্স দিবস পালিত হয়ে আসছে। এ বছর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হাতে এমন অনেক সাফল্য রয়েছে যেগুলো স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। আমরা এইচআইভি/এইড্স মোকাবেলায় একটি পরীক্ষিত পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পেরেছি। এই রোগের কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও আচরণ পরিবর্তনের কৌশল, এইড্স একটি কলঙ্কময় রোগ এরকম ভ্রান্ত ধারণার অবসান, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার ও সুশীল সমাজের মধ্যে একসাথে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করা -- এগুলোকে এবছরের বিভিন্ন সাফল্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা এটা জানি যে নেতৃত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। রোগটি ছড়িয়ে

পড়ার আগেই দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারলে এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব। এমনকি মহামারীকেও রোধ করা অসম্ভব নয়। আর এর ফলে পরিবার, সমাজ ও বিভিন্ন জাতির উপর যে বোঝা চেপে বসেছে তা আমরা কমিয়ে আনতে পারি। এর আগে এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধ না কি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত তা নিয়ে বিতর্ক ছিলো। কিন্তু এখন খুব সংখ্যক মানুষই এই মতের বিরোধিতা করবেন যে ক্ষেত্রে মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব, সেক্ষেত্রে অবশ্যই যে কোন মূল্যে সেটি করতে হবে। এইচআইভি/এইড্স সংকট মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এগিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এইড্স, যক্ষা ও ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধের জন্য গঠিত বিশ্ব তহবিল ও অন্যান্য বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান।

গত বছর বিশ্ব এইড্স দিবস পালন করার পর এপর্যন্ত আরো প্রায় ৫০ লাখ মানুষ এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। প্রিয়জনকে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় রেখে, নিজের সন্তানের জীবনকে নিয়তির হাতে ছেড়ে দিয়ে আর সর্বোপরি নিজ নিজ সমাজকে বিনাশ করে এই সময়ের মধ্যে আরো ৩০ লাখ মানুষ মারা গেছে। অন্যদিকে এইড্স এখন নারী সমাজের জন্যও বড় একটি সমস্যা। সারা বিশ্বে যত মানুষ এই রোগে আক্রান্ত তার মধ্যে অর্ধেকের বেশীই হচ্ছে নারী। আর এই অনুপাত দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী, যাদেরকে সমাজের সবচেয়ে কর্মক্ষম নাগরিক হিসেবে মনে করা হয়, এইচআইভি/এইড্স তাদের জীবন কেড়ে নিয়ে উন্নয়নের মৌলিক সূত্রকেই হুমকির মুখে ফেলছে। উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন প্রতিটি প্রজন্মই তাদের আগের প্রজন্মের চেয়ে ভালো করে থাকে। এইচআইভি/এইড্স-এর ব্যাপক বিস্তারের ফলে দারিদ্র্য আরো বেড়েছে, মানুষের গড় আয়ু কমছে, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় ঘটছে এবং পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের ভালোবাসা, নির্দেশনা আর সহায়তা ছাড়াই একটি প্রজন্ম বেড়ে উঠছে। আমরা যখন বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের জয়যাত্রাকে উদযাপন করছি ঠিক সে সময়ই এইড্স উদীয়মান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতিশক্তিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। কেননা এসব দেশের অনেক সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী এইচআইভি/এইড্স-এর শিকার।

এ বছরের জুলাই মাসে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এইড্স কমিটির সেক্সুয়ালি ট্র্যান্সমিটেড ডিজিজ (এসটিডি) কর্মসূচী যে তথ্য প্রকাশ করেছে তা সত্যিই উদ্বেগজনক। তারা বলছে যে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক সেবনকারীদের মধ্যে এইচআইভি ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়েছে। এটা একটি বড় ধরনের উদ্বেগের বিষয়। কেননা এশিয়াতে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি/এইড্স সংক্রমণের ব্যাপক বিস্তৃতির একটি ব্যতিক্রমী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে বোঝা যায় যে কনডম ব্যবহারের মতো আচরণগত পরিবর্তনের গতি খুবই শ্লথ। মাদকসেবীদের মধ্যে একটি ইনজেকশনের সূচ কয়েকজনের মধ্যে বারবার ব্যবহার করার প্রবণতাও অগ্রহণযোগ্য মাত্রায় বেশী।

যদিও এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি ভাইরাসের সংক্রমণ বেশ কম, তবুও দারিদ্র্য, লিঙ্গ বৈষম্য এবং ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাথে ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে বাংলাদেশেও এই রোগটি মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। ভারত ও এই অঞ্চলের অন্য রাষ্ট্রগুলোতে ইতোমধ্যেই এইড্স মহামারী রূপ নিয়েছে।

''এইড্স সংক্রমণের হার কম" এমন রাষ্ট্র থেকে ''মহামারী আকারে ধারণ করা রাষ্ট্রগুলোর নিকটবর্তী দেশ" হিসেবে উত্তরণ ঠেকাতে বাংলাদেশবে অবশ্যই অতি গুরুত্বের সাথে ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষ করে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকসেবী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কাজ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সত্যিকারের ভালো ও মানসম্পন্ন প্রতিরোধ কর্মসূচী। কেবল ''সচেতনতা বাড়ানোর" মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নিরাপদ আচরণের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যও পদক্ষেপ নিতে হবে।

'ইউএসএআইডি'-র অর্থায়নে 'ফ্যামিলি হেল্থ ইন্টারন্যাশনাল' ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করে যেতে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশে একটি কার্যকর এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য এই ভাইরাসের সংক্রমণ সনাক্তকরণ ও অন্যান্য গবেষণায় ফ্যামিলি হেল্থ ইন্টারন্যাশনাল তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

আইনের যথাযথ প্রয়োগ খুবই জরুরী যাতে করে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি কমিয়ে আনা যায়। তবে আইনের প্রয়োগ এমনটা হওয়া কখনোই উচিত নয় যার ফলে যৌন কর্মী ও মাদকসেবীসহ অন্যান্যরা এইচ.আই.ভি ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধের জন্য যেসব সেবা রয়েছে তার আওতা থেকে ছিটকে পড়ে। যেসব সমাজকর্মী এইচআইভি আক্রান্ত রুগীদের সাথে কাজ করে তারাও এই রোগটি ও অন্যান্য যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে এমন ভুল ধারণা করা উচিত হবে না। এরকম মনে করাররও কোন কারণ নেই যে এইসব সমাজকর্মীরা বিপদজনক ও সমাজবিরোধী আচরণকে উৎসাহিত করছেন।

প্রেসিডেন্ট বুশের ইমার্জেন্সি প্ল্যান ফর এইড্স রিলিফ-এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী এইচআইভি/এইড্স চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কাজ করে যাচ্ছে। যেমনটা প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, ''যেসব ক্ষেত্রে মৃত্যু ও রোগবালাইয়ের যন্ত্রণা প্রতিরোধ করা সম্ভব, সেক্ষেত্রে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে রোগাক্রান্ত এসব মানুষদের জন্য কিছু করা। আর আমরা সেটা করছি।" ১৫ বিলিয়ন ডলার খরচ করে প্রেসিডেন্ট বুশের এই জরুরী কর্মসূচী ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে। এই কর্মসূচীর লক্ষ্য হলো ৭০ লাখ নতুন রোগীকে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা, ২০ লাখ এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তিকে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং বিশ্বের ১ কোটি এইড্স আক্রান্ত রুগী ও তাদের এতিম সন্তানদেরকে সেবা করা। এইড্স নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠিত বিশ্ব তহবিলে যুক্তরাষ্ট্র আরো একশ' কোটি ডলার অতিরিক্ত অনুদান

দিচ্ছে প্রেসিডেন্ট বুশের এই পরিকল্পনার আওতায়। এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র এই তহবিলে ১.৬ বিলিয়ন ডলার যোগান দিয়েছে যা আজ পর্যন্ত তহবিলে প্রতিশ্রুত মোট অনুদানের প্রায় অর্ধেক। দ্বিপাক্ষিকভাবে আমরা যে ৭৫টি দেশকে এইচআইভি/এইড্স-এর নতুন সংক্রমণ রোধ ও এইড্স আক্রান্ত সমাজে এর বোঝাকে কিছুটা লাঘব করার জন্য সাহায্য দিয়ে যাচ্ছি তাও অব্যাহত থাকবে। আমরা ১৪টি রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করেছি যেখানে পৃথিবীর মোট এইচআইভি/এইড্স আক্রান্ত রুগীর মধ্যে অর্ধেকের বসবাস। এই রাষ্ট্রগুলোতে আমাদের সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯শ' কোটি ডলারে। এইড্স-এর মতো আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সমস্যার মোকাবেলায় একক রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রই যে সবচেয়ে বেশী অঙ্গীকারবদ্ধ তা আমাদের এসব উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়।

সন্দেহ নেই যে এইচআইভি/এইড্স আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই রোগটিকে নিশ্চিহ্ন করতে হলে আমাদের সবাইকে নিরন্তর ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আমাদের কর্মকান্ডের সবচেয়ে ভালো ফলাফল পেতে বিভিন্ন দেশের সরকার, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বহুপাক্ষিক বিভিন্ন সংগঠন এবং বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণে একসাথে কাজ করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট বুশের পরিকল্পনার লক্ষ্যও অর্জন করা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্র একা এসব লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। এমনকি ৭০ লাখ মানুষকে এইচআইভি/এইড্স ভাইরাসের সংক্রমনের হাত থেকে রক্ষা করা, ২০ লাখ আক্রান্তকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আর ১ কোটি মানুষকে সেবার ব্যবস্থা করা ভীষণ দুরূহ কাজ। এক সাথে কাজ করলে আমরা কিছু অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা নিতে পারবো যার মাধ্যমে এমন একটা পৃথিবী প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যেখানে এইড্স ভবিষ্যতের জন্য দুঃসহ অবস্থা তৈরি করবে না।

এক সাথে কাজ করতে হলে এইচআইভি/এইড্স-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সরকার, সমাজ, ধর্মীয় ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সব ক্ষেত্রের নেতৃবৃন্দকে এগিয়ে আসতে হবে। বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান, যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশ এবং বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলো এই উদ্যোগের অংশ হতে আগ্রহী। কিন্তু দাতাদের পক্ষে বিশ্বের সব শিশুকে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব নয়। সংকটপূর্ণ স্বাস্থ্য অবকাঠামো তৈরি ও তা সংরক্ষণ করা, বিশ্বের সকল মানুষের মাঝে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা কিংবা প্রতিটি কর্মচারী ও প্রত্যেক প্রতিবেশীকে সেবা করাও দাতাগোষ্ঠীর পক্ষে অসম্ভব। বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে এই রোগ প্রতিরোধে অবশ্যই কথায় ও কাজে আন্তরিক হতে হবে। বাংলাদেশের মতো মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর নাগরিকদেরকেও এক্ষেত্রে সহযোগিতা মজবুত করার জন্য সরকারকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এইচআইভি/এইড্স কোন সীমানা মানে না। এই রোগ জাতিসত্ত্বা, লিঙ্গ, বয়স বা ধর্মভেদেও কোন পার্থক্য তৈরি করে না। আপনি এই রোগকে অবহেলা করতে চাইলেও, এইড্স আপনাকে অবহেলা করবে না।

অজ্ঞতা ও ভয় ছড়িয়ে পড়লে অন্য সব ক্ষতিকারক রোগের মতো এইড্স-এর ব্যাপকতাও বাড়ে। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে যখন কোন দেশের সরকার ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ এইচআইভি/এইড্স-এর বিপদ ও ঝুঁকির বিষয়গুলো নাগরিকদের সামনে তুলে ধরে এবং জনগণকে এ বিষয়ে অবগত করার কর্মসূচীকে সাহায্য করে তখন এই রোগটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

গবেষকরা ধারণা করছেন যদি এখনই প্রতিরোধ করা না যায় তাহলে সারা বিশ্বে আগামী ২০১০ সালের মধ্যে সাড়ে সাত কোটি মানুষ এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হবে। এর ফলে আগামী ২০২০ সালে এইড্স-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত মানুষের সংখ্যা দাঁড়াবে ১০ কোটিতে। আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের পৃথিবীকে এমন হতে দেবো না। আসুন আমরা পিছন ফিরে তাকাই এবং এটা বলি যে বিশেষজ্ঞরা আমাদের উদ্যোগ, কর্মক্ষমতা ও আন্তরিকতাকে খাটো করে দেখেছেন। আসুন এবারের বিশ্ব এইডস দিবসকে এই রোগের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াবার সন্ধিক্ষণ হিসেবে পালন করি।

==========

জিআর/ ১লা ডিসেম্বর, ২০০৩

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮১৬৭৭; ই-মেইল: ফযধশধ@ঢ়ফ.ংঃধঃব.মড়া এবং ডবনংরঃব: যঃঃঢ়://ীীী.ংবসনধংু-ফযধশধ.ড়ৎম) যোগাযোগ করুন।